শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ও সংস্কৃতি

বি.এ

ক্লাস, ০৭/০৮/১৮

স্বাগতা পতি

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যে বিষয়বস্তুর উপকরণ, উপাদান হিসেবে সমকালীন সমাজ জীবন সাহিত্যে প্রোথিত হয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য, যে কাহিনী বহু আগ থেকেই বাংলায় নানা মূর্তিতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস এ কাহিনী নির্মাণে সম্পূর্ণত পুরাণকে আশ্রয় করেন নি বলেই কবি স্বাধীনভাবে বহু নতুন ঘটনা সন্নিবিষ্ট করায় সমকালীন সমাজের উপাদান চিত্রিত হয়েছে।

বাল্যবিবাহ যে তখনকার সামাজিক রীতি ছিল তা রাধার বাল্যবিবাহতে প্রমাণিত। গোপ কিশোরীর রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধ রমণীকে নিয়োগ করা হত। উদ্ভিন্ন কিশোররি রক্ষণাবেক্ষণে ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধ রমণীকে নিয়োগ করা হত। বধূকে শাশুড়ি তখন সচরাচর বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। বধূজীভন শাশুড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। বাড়ির যেতে শাশুড়ির অনুমতির প্রয়োজন হত। অপরাধ পেলে স্ত্রীকে স্বামী মারধর করত।

এ কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবির পরিচয় মেলে। তবে গবাদিপশু প্রতিপালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। নদীমাতৃক বাংলার গ্রাম্য সমাজের খেয়াপারের জন্য কিছু মানুষ মাঝিগিরি করত। নৌকা তৈরির জন্য মিস্ত্রি, করাতি ইত্যাদি পেশার মানুষ ছিল।

নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহবধূকেই গৃহের সকল কর্ম সম্পন্ন করতে হত। শাক-ঝোল-অম্বল ইত্যাদি ভালমন্দ রেঁধে বধূরা যত্নের সাথে স্বামী ও সংসারের সবাইকে খাওয়াত। জল আনতে দলবদ্ধভাবে মেয়েরা নদীতে যেত, নদীর জলই ছিল তাদের পানীয়। তখণ টিউবওয়েল ছিল না।

তখনকার গ্রাম্য সমাজে অশিক্ষিত নারী-পুরুষ পরস্পরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করত। তখনকার নারীদের কারণে, অকারণে শপথ করা ছিল তাদের স্বভাবধর্ম। কৃষ্ণকে বড়াই বলেছেন তার কথা যদি সে না শোনে তবে ব্রহ্ম হত্যার পাতক হবে। তাদের মনে এ বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের বিচারে পাপীর দণ্ড ও পুণ্যবানের পুরষ্কার আছে।

"পুণ্য কইলেঁ স্বগগ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ

পাঁপে হএ নরকের ফল।"

অভীষ্ট সিদ্ধির আকাঙ্খায় তখন দেবতার দরবারে পূজা ও দান করার প্রথা ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, সুতীর্থে তপস্যা করলে বা স্নান করলে প্রেমের ক্ষেত্রে নারীর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়্ নদীপথে বিপদগ্রস্থ হলে নদী ও পবনকে মানত দিত।

মন্ত্রতন্ত্রেও লোকের বিশ্বাস ছিল। মূর্ছিতা রাধাকে ঝাড়ফুঁকের দ্বারা জাগ্রত করা হয়। বড়াই বাণ মেরে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়ায়, সেই অবকাশে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে। স্বকৃত পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্তের বিধান সমাজে প্রচলিত ছিল।

"ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ,

সব মোর করমের ফল, পুরুব জনমে

কৈল করমের ফল।"

- ইত্যাদি উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, কবির সমকালে বাঙালি জন্মান্তর, কর্মফল ও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিল। তখনকার সমাজে শক্তিদেবী চণ্ডী বিশেষভাবে পূজিত হত। তখনকার লোক বেশিরভাগই শাক্ত ছিল। রাধাকে বড়াই বলেছে- যত্নসহকারে চণ্ডকে পূজা করে সন্তুষ্ট করতে পারলেই কৃষ্ণের সন্ধান মেলবে।

সমাজে নারীর বিশ্বাস- স্বামী যাকে উপভোগ করে সেই রমণীই সতী। পরপুরুষের সংসর্গে কুল নাশ হয়।

সমাজের উচু বংশের মানুষের স্বভাব আচার-আরচণ ছিল মহৎ। নিচু বংশীয়দের আচার ছিল নিচু। পেশার ভিত্তিতে সে সমাজে মানুষের সম্মান নির্ভর করত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল, যা ভারতবাহী মজুর কৃষ্ণ ও মালিক রাধার কথাবার্তায় বুঝা যায়। তাছাড়া দরিদ্র মানুষ ধনী মানুষের মেয়েকে বিয়ের সুযোগ পেত না। তখনকার সমাজে বিশেষত নারীদের মদ্যে কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। বাড়ির বাইরে যেতে বাধা পেলে, টিকটিকি ডাকলে, হাঁচি আসলে, তেলিকে তেলি নিয়ে যেতে দেখলে, ডানের শেয়াল বামে গেলে, শুকনা যালে কাক ডাকলে, ভাঙা পাখায় বাতাস দিলে, দাঁত দিয়ে কূটা কাটলে সমূহ অমঙ্গল হয়। অযাত্রা, কুযাত্রা সম্পর্কে এমনি সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ছিল তাদের।

স্ত্রীলোকেরা সচরাচর না পরলেও বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কণ্ঠে গজমুক্তার হার, কানে রতন, কুণ্ডল, বাহুতে আঙ্গদ বা কনক যূথিকামালা, কটিদেশে কনককিঙ্কিণী, করাঙ্গুলিতে আঙ্গুঠী, পদাঙ্কগুলিতে পাসালী ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহার করত।

সমাজে চোর ছিল, ছিল দস্যু-ডাকাত। কড়ির বিনিময়ে যে কোন কাজের জন্য শ্রমিক/কুলি পাওয়া যেত। নদী পারাপারে কড়ির প্রচলন ছিল। খেয়াঘাটে বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইজারাদারির প্রথা ছিল। সমাজে শক্তিশালীদের হাতে দুর্বলেরা নিগৃহীত, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হত। কংস রাজার অত্যাচারের অনুষঙ্গে রাজ্যের জনগণের প্রতি রাজার অত্যাচারের বিষয়টি স্পষ্ট। রাজকর আদায়ের রীতি ছিল। হাটে-খেয়াঘাটে ও পথে শুষ্ক আদায়ের প্রচলন ছিল। হিসাবনিকাশ কড়ি দিয়ে করা হত। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারে রাজার কাছে নালিশের রেওয়াজ ছিল। কোন কিছুর বিনিময়ে বন্ধকী প্রথ ছিল। নারী হত্যা তখন সর্বাধিক নিন্দনীয় পাপকর্ম বলে বিবেচতি হত। শতখানেক ব্রহ্ম হত্যাতে যে পাপ এক নারী হত্যাতে সমান পাপ হত।

তখনকার সমাজে বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ নেতবস্ত্র সহযোগে পৌঁছাবার রীতি ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে গেলে তাকে পান-তামাক দিয়ে আতিথেয়তা করত। বিবাহিত নারীর পরপরুষে প্রেম সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হত। সাল, তারিখ গণনার জন্য পঞ্জিকার প্রচলন ছিল।

কৃষ্ণের লাম্পট্যের মাধ্যমে সমাজের প্রাকৃত জীবন শত শত লাম্পট্যের জাল বিস্তার ও গ্রাম্য সরলা বাহু নারীর প্রণয়বঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা শিল্পী চিত্রিত করেছেন। তৎকালীন সমাজে সুবিধামত সময়ে মানুষের প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। রাধার প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের মাধ্যমে বিয়টি ধরা পড়ে-

(ক) আম্মাকে বল কৈলে তোর নাহি কিছু ফল

মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারিকেল।

(খ) আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

(গ) মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।

(ঘ) যে ডালে করো যো ভরে সে ডাল ভঙ্গিল পড়ে।

(ঙ) সোনা ভাঙিলেেআছে উপায় জড়িএ আগুন তাপে

পুরুষ নেহা ভাঙিলে জুড়িএ কাহার বাপে।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ হতে আমরা তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তা পমিাণে বেশি না হলৌ তার মূল্য কম নয়। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি মনের ছাপটি নিঃসন্ধিগ্ধভাবে অনুভব করা যয়। মধ্যযুগের কাব্য সমাজের চালচিত্র তুলে ধরার অভীষ্টে রচিত না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালি ভাবচেতনা ও জীবনরস বোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।